আখাতাজ্জামান ইলিয়াসের সময় ও তাঁর কিছু ছোটগল্প

ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়

।। এক ।।

নিজেকে তিনি ভাবতেন এক পাথরচাপা জনগোষ্ঠীর অংশ, স্রেফ বাঁচার তাগিদে যারা মাঝে - মাঝে মাথা ঝাঁকায়। ঘোর যৌবন থেকে তাই জড়িয়েও যান প্রতিবাদ - প্রতিরোধে ফুলে - ফেঁপে ওঠা একটা পরিবেশেৰ সঙ্গে। তখন পূর্ব - পাকিস্তানে সামরিক শাসনের নির্মমতায় সাধারণ মানুষের অসহায়তা ছাড়া আর কোন বাস্তব নেই কারো সামনে। আইয়ুব - শাহীর অবসান ছাড়া দ্বিতীয় কোনো লক্ষ্যও থাকে না। বিক্ষোভ - আন্দোলনগুলোর। কিন্তু বারে বারেই ব্যর্থ হয় সেসব প্রতিরোধ। আইয়ুব শাহীর অস্তিত্ব ঠিক ঠিক থাকে বন্দুকের জোরে। কারচুপি - কন্টকিত নির্বাচনের দৌলতে। গ্রামে- গ্রামে গড়ে ওঠে তার অনুগত এক গোষ্ঠী। আখতাজ্জামানের ভাষায়, 'এরা নতুন এলিট, এদের নাম বেসিক ডোমেক্র্যাটি।'

আইয়ুব -জমানার ডালপালা যখন ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের গহনতম স্তরে, অনাচারের সবকটি প্রকারের নির্বিচার প্রয়োগে বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজনগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল নিম্ন - মধ্যবিত্ত ও গরিব মানুষেরাই মূলত। 'চিলেকোঠার সেপাই' এর খয়বারগাজী, হোসেন আলি ফকিরদের মতো প্রশাসন - পোষিত মাফিয়াদের দোর্দণ্ড প্রতাপ তখন দেশের সর্বত্র। তবে কেন্দ্রীয় শোষণ ও সন্ত্রাসের পাশাপাশি সমকালের একটা পজিটিভ লক্ষণও ইলিয়াসের মতো সংবেদী মানুষদের প্রবলভাবে নাড়া দেয়। সেটা হল, 'বিপুল একমানবগোষ্ঠীর উঠে দাঁড়ানো'। এই মানবগোষ্ঠীর পুরোভাগে থাকে চেংটু, আনোয়ার, ওসমান ও হাড্ডি খিজির। সর্বোপরি থাকে আলিবক্স, শ্রেণীশত্রু খতমের পরোয়ানাকে বাস্তব চেহারা দিতে যার হাত কাঁপে না একটুও।

১৯৬৯ - এ এই মানবগোষ্ঠীর উঠে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টায় যখন গণবিদ্রোহের পরিবেশ সৃষ্টি হল পুব - পাকিস্তানে, আখতাজ্জামান পূর্ণ যুবক। নিবিড়ভাবে তখন তিনি পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন নকশালবাড়ি আন্দোলনের গতি - প্রকৃতি, কিংবা চিনের ঘটনাপ্রবাহ। জগন্নাথ কলেজে এর মধ্যে তাঁর শিক্ষা - জীবনের চারবছর কেটে গেছে। আবদুল্লাহ্ আবু সয়ীদ সম্পাদিত 'সাম্প্রতিক ধারার গল্পতে অন্তভুক্ত হয়ে গেছে তাঁর 'স্বগত মৃত্যুর পটভূমি', যা আসলে এক অনুভবী যুবকের মধ্যে তরঙ্গায়িত অসংখ্য সংবেদনার ভাষা - রূপ।

এই গল্পের প্রথম লাইন থেকেই তিনি পাঠকের ভরসা আদায় করে নিয়েছেন এইভাবে - 'সূর্যের প্রখর অন্ধকার ও অজস্র মানুষের ভয়াবহ নির্জনতায় গোরস্থানের গৃহস্থ শবেরা আর্তনাদ করে উঠল।' এখানে অবশ্যই রক্তলিপ্ত একটা কাল উপস্থিত, হাড্ডি খিজির ও ওসমানদের যা স্থির থাকতে দেয় না। এই গল্পেই আছে লেখক হিসাবে ইলিয়াসের অসামান্য সম্ভাবনার ইঙ্গিতও। যেমন, 'মানুষরাস্তায় দাঁড়িয়ে মানুষ গোনে। কবিতায় সন্ধ্যার পাখী গোনে; কিন্তু শ্বাস গোনে না।' এতে কোন কাহিনি বা ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ নেইযার ভেতর দিয়ে স্থূলভাবে উঠে আসতে পারে একটা কালখণ্ড। পরিবর্তে এখানে এমন কিছু উচচারণ আছে যা শুনে বোঝা যায়, এর লেখক যে সময়ের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে তা একটা সংশয়কেই লালন করে। কখনও তরাসকেও। যেমন, 'ভয়াবহ, ধূসর, বোবা একচোখ কানাকিন্তু নিয়মিত জনৈক আতঙ্ক সমগ্র আমার প্রত্যেকটি অংশকে দুর্নিবাররূপে উপভোগ করতে করতে আমার প্রচণ্ড অনিচ্ছায় আমাকে ধর্ষণ করে।' এই গল্পের কাহিনিহীনতাও মনে হয় সময়োচিত। দিশাহীন, বিভ্রান্ত একটা বর্তমানকে কাহিনির পটে ধরতে গিয়ে তার চারিত্রিক অস্পষ্টত

াই যেন উঠে এসেছে গল্পটির খানিক বিমূর্ততায়।

এই গল্প প্রকাশের বেশ ক'বছর বাদে ঘটে যাওয়া ১৯৬৯-এর গণ - অভ্যুত্থান অনেকখানি বদলে দিয়েছিল ইলিয়াসের কণ্ঠস্বর। তখন তিনি যেন অনেক স্পষ্ট করে চিহ্নিত করতে পারছেন প্রতিটি সামাজিক তরঙ্গকে। ১৯৬৯ -এর বিদ্রোহ স ম্পর্কে তাঁর অনুভবটা প্রসংগত স্মরণীয় 'এই প্রথম একটি আন্দোলন দেখছি যেখানে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এমনভাবে এগিয়ে এসেছিল যাতে শুধু রাষ্ট্র নয়, সামাজিক শাসনপদ্ধতিটিই আক্রান্ত হয়েছিল। যেখানে শোষক বলে চিহ্নিত হয় তারাই যারা যুগযুগ ধরে শোষণের কর্মটি করে এসেছে। সে বাঙালি না পাঞ্জাবি, বিহারি না হিন্দু এ নিয়ে কারো মাথা - ব্যথা ছিল না', (আমি ও আমার সময়)।

তাঁর পর্যবেক্ষণের এই অবধি কোন জটিলতা নেই। শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বময় পটভূমিতে নতুনত্ব নেই কিছু। কিন্তু তার ঠিক পরবর্তী পর্যবেক্ষণটি এই বাস্তবের অন্য এক দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরায় 'ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করে, রক্ত দিয়ে, কার্ফু ধুয়ে মানুষ যাদের ছিনিয়ে আনে, বেরিয়ে এসে তারাই তৎপর হয় আন্দোলনকে নেতিয়ে দেওয়ার কাজে--- এটাও তো ঘটেছে আমার সময়েই', (তদেব) । আমাদের দেশের বহু জাতীয় আন্দোলনের স্মৃতিতেও এই একই বাস্তব দগদগে ক্ষতের মতো গেজে আছে।

ইলিয়াস অবশ্য দ্বিধাহীন কণ্ঠে স্বীকার করেন, 'আমার সময় ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা দিয়ে আঁকা।' কিন্তু পরক্ষণেই এই অব্যর্থ সত্য বাচনে তিনি যে একটা স্বপ্নভঙ্গকেই ভাষা দেন, 'ফের স্বাধীনতা আসে। এবার স্বাধীনতা নম্বর ২। সঙ্গে আসে কি? মুক্তি? --- না, সঙ্গে আসে নতুন লাঠি কোমর বেঁধেছে।' স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পর তার সামাজিক চেহারাটা এভ াবেই ভারাক্রান্ত করেছিল ইলিয়াসদের। কেউ একে বলেন মোহভঙ্গের যন্ত্রণা। কিন্তু সত্যিই কি কোন মোহ ছিল ইলিয় াসের? তাঁর রচনার পাঠক্রিয়ায় অন্তত যেটুকু উঠে আসে আসে তাতে তাঁকে তো একেবারে বিমুক্ত চেতনার মানুষ বলেই মনে হয়, যিনি নৈর্ব্যক্তিক চোখে তাকাতে পারেন সমাজের দিকে, সমাজের ভাগ্য নিয়ন্তাদের যে কোন ভ্রান্তি, দোলাচল যাঁর চোখ এড়ায় না। এককথায় মানব - শত্রু শনাক্তকরণের জন্য তিনি বাইরের দিকে তাকান যেমন, তেমনি তাকান ভেতরের দিকেও। এবং তা অবশ্যই অকম্পিত চোখে। তাঁর অন্যসব রচনার মতো গল্পগুলোর তি পরতে লগ্ন হয়ে আছে এই অ াত্মসমীক্ষার সৎ অভিপ্রায়। এই সততার কারণেই দেশের মার খাওয়া মানুষের ওপর নতুন পতাকার দণ্ড হাতে নতুন শ াসকদের ঝাঁপিয়ে পড়ার ঘটনাকে তিনি ধিক্কার জানাতে কুণ্ঠিত হন না। স্বাধীনতা - পরবর্তী অনাচারের সূত্রে সে দেশে অ াসে দুর্ভিক্ষ (১৯৭৪)। আখতাজ্জামান লেখেন, 'এবার জন্ম হল আমার ছেলের। ছেলে জন্মে দেখে হাজার - হাজার ম ানুষ মরে যাচ্ছে ফ্রেফ না খেতে পেয়ে। পাশাপাশি রাজার মেয়ের বিয়ে হয়, মাথায় তার সোনার মুকুট', (আমি ও আমার সময়)। এই মুজিব - জমানায় সাধারণ মানুষের আশাহত হওয়ার বেদনাটা বহন করতে তিনি সংশয়ী প্র ছুঁড়ে দেন ঃ 'কে ানটা ঠিক --- স্বাধীনতা, না দুর্ভিক্ষ ও রাজারাজড়ার বিয়ে সোনার মুকুট দিয়ে?'

মুজিব - জমানাও শেষ হয় একদিন। ইলিয়াসের ভাষা একে ফুটিয়ে তোলে এভাবে 'আবার একরাতে রাতারাতি ভাণ্ডার হাতবদল ঘটে। ডাণ্ডা, তুমি কার? না, যে আমাকে কব্জা করতে পারে তার। এবার ডাণ্ডা দখল করেছে পেশাদার ঠ্যাঙ াড়েরা। এদেরি মনিব থাকে বাইরে, সমুদ্রের ওপার পাহাড়ের ওপার। মনিবের লেলিয়ে দেওয়া ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশবাসীর পর। দেশবাসী, যারা নিরন্ন, যাদের পরনে জামা নেই, হাতে হাতিয়ার নেই'; (তদেব)।

ইলিয়াস আরও বেশি যন্ত্রণা বোধ করেন যখন দেখেন, প্রথম যৌবনে সমাজবদলের জন্য হাঁক-ডাক শুনে যাঁদের মহামানব বলে ভেবেছিলেন, মালপানি ও ডাক্তার ভাগ নেওয়ার লোভে তারাই নিজেদের ল্যাজ থেকে মুণ্ডু পর্যন্ত বিক্রি করে দিচ্ছে সেই ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর কাছে। আমাদের দেশীয় রাজনৈতিক বলয়ের ছবিটাও বিশেষ আলাদা কিছু নয়। ইলিয়াসের ক্ষে াভ মাত্রা ছাড়া যখন নির্বিচারে মানুষ মেরে - মেরে ক্লান্তি জাগলে সেই ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীই রিমোট কন্ট্রোল থেকে মালিক - হুজুরের হুকুম পেয়ে ট্যাঙ্কের ওপর বসে গণতন্ত্র বিলোতে থাকে।

ইলিয়াসের কাছে তাঁর সময় কোন নিশ্চিত বৈশিষ্ট্যে ধরা দেয় না আদৌ। তাঁর অনুভবের গভীর থেকে তাই উঠে আসে এরকম স্বগতোক্তি 'আমার সময়ের দেয়ালের ভেতর আমি শুধু হাঁসফাঁস করি। এভাবে বাঁচা মুশকিল। বড়ো কিছু অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য নয়, প্রধানত বাঁচার তাগিদেই জীবনদায়ীশ্বাসগ্রহণের ব্যাকুলতায় 'পায়ের পাতায় ভর দিয়ে' দেয়ালের ওপারে তিনি দৃষ্টি ছাড়াতেচান। কিন্তু কী দেখেন ওপাশে? দেখেন, অতীতের যতটুকু দেখা যায় সেখানেও

তিনিই। সেখানে সর্বত্র তাঁরই 'বসবাস'। একের পর - এক জানোয়ারের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে তাঁর এই বিকল সময়ে এসে পৌঁছনো, তাঁর সবটুকু 'হয়ে ওঠে'। এখন জানোয়ারটা তাঁকে কিছুতে দেয়ালের ওপারে তাকাতে দেয় না। প্রথম - প্রথম একে অতিকায় কোন প্রাণী বলে ভ্রম হলেও শেষ অবধি দেখেন ওটি আসলে ইঁদুরের পয়দা' এক ইতর জীব। ইলিয়াসের কলম আজীবন সচল থেকেছে যে উদ্দীপনায় তা হল, ভাবী কাল তাঁর 'পঙ্গু' সময়কে ওই ইতর জীবটির সঙ্গে লড়াই করার সময় বলে অন্তত শনাক্ত করবে।

।।দুই ।।

আখতাজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প এই সময়ের তীব্রতম কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠার দাবি রাখে। সমকালের পজিটিভ অনেককিছু যেমন তাঁর নজর এড়ায় না, তেমনি, পূর্বেই উল্লিখিত, তিনি সজাগ থাকেন স্বজন ও স্বজাতির সামান্যতম বিচ্যুতি বিষয়েও । আর সেকারণেই 'হিন্দু সাপ্রেশন' নিয়ে লিখে ফেলেন দুটি গল্প --- 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' ও 'খোঁয়ারি', সেখানে তিনি হিন্দুদের দমিত চেহারাকে নিয়ে আসেন আন্তরিক সহমর্মিতায়। এ প্রসংগে তাঁর বক্তব্য 'তুমি যে মুহূর্তে দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা করছ সে মুহূর্তে হিন্দুরা সেকেণ্ড ক্লাস সিটিজেন হয়ে যাচ্ছে।' সাম্প্রদায়িকতা ভারতে আরো বেশি আছে, মানেন তিনি। কিন্তু তার সঙ্গে এটাও যোগ করতে ভোলেন না,... 'সেখানে আবার সাম্প্রদায়িকতার বিদ্ধে লড়বার শক্তিও প্রচুর আছে। সে শক্তিটাতো এখানকার হিন্দুদের নেই। না থাকার কারণ এখানকার হিন্দুদের অর্থনীতির উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।'

'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পটির সময় স্বাধীনতা - উত্তর বাংলাদেশ। গোলমালের কালে অসংখ্য হিন্দু বাঙালির মতো কেলকাতায় পালিয়ে গিয়েও প্রদীপ ফিরে এসেছিল তার জন্মভূমিতে, স্বজনদের উষ্ণতা ফিরে পেতে। তার পিসীমার মৃদুস্বরে গাওয়া গান তার 'ঘুমের পাতলা সরের ওপর টুপটাপ ঝরে পড়ে'। বাল্যকালের এরকম সমস্ত জলজ স্মৃতির টানেই তার ফিরে আসা। কিন্তু এসেই বা কী দেখে সে, কী শোনে? সম্পর্কে তার পিসতুতো ভাই, আদ্যোপান্ত ব্যবসায়ী ননীদা, বলে, 'এই দ্যাশে ক্যামনে থাকি? বিজনেস এট্টু যদি ভালো হইয়ে তো চান্দা লইয়া ব্যাকটি পয়সা খসাইয়া লইবো।' ওর বৌদির গলাতেও ক্ষোভ 'পোলার বয়সের ছ্যামরাগুলিরে তোয়াজ করো, আবার হেইগুলির ডরে মাইয়ারা বারাইতে পারে না। আর কলেজ যাইতে পারবো?' এসব ইলিয়াসের পর্যবেক্ষণে সম্ভবত হিন্দু সাপ্রেসনের ছোটখাটো নমুনা। কিন্তু নিছক হিন্দু সাপ্রেসনে আটকে গেলে গল্পটা জোরালো হত না। আর সেকারণেই লেখক ধরতে চেয়েছেন প্রদীপ চরিত্রটির মনের অতলে জেগে ওঠা অসংখ্য স্রোত - প্রতিস্রোতকে। কোন স্মরণাতীত শৈশব থেকে সে চেতনায় বয়ে নিয়ে চলে পিসীমার মতো স্বজনদের কণ্ঠস্বর। গানের সুর। উঁচু - নিচু শব্দমালা। শব্দগুলো জলীয় প্রকারে তার চোখে ঝরে পড়লে চোখজোড়া তার খুব বড়ো ও টাটকা মনে হয়। ননীদার ছেলে অমিতের ঘরে একা শুতে গিয়ে বিছানার নিচে পর্ণোগ্রাফি খুঁজে পেয়ে তার পাতা উল্টোতে - উল্টোতে তীব্র কামবোধে আচ্ছন্ন হবার পর প্রদীপ যখন খানিক ঘুম ঘুম বোধ করছে ঠিক তখনই ওর কানে ভেসে এল বৃদ্ধা পিসিমার সুর 'জীবন আমার বিফলে গেলো...।' ছিটকিনি খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায় প্রদীপ। এরপরই পিসীমার আপ্যায়নে সদ্য ভাজা লাল মুড়ির স্বাদে বুঁদ হয়ে লুপ্ত অতীতকেই ফিরে পেল যেন। কিন্তু তা বড়ো ক্ষণিকের জন্য। হঠাৎই ওর চোখের সামনে থেকে গুন গুণ করে গাইতে গাইতে পিসীমা শরীরমুক্ত তরল দশায় নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকে কোন শূন্যতায়। প্রদীপের গলায় মুড়ি বেঁধে কাঁটার মতো। ও চিৎকার করে ওঠে, 'মা'। পরমূহূর্তেই অবশ্য পিসীমা আবার চেনা আকারে। ওর মুখে ঘাড়ে তিনি হাত বুলিয়ে দেন। বলেন, 'তরে লইয়া আমি কি করি?'

এ-গল্পে ইলিয়াস একাত্ম হয়ে গেছেন শেকড়ছেঁড়া মানুষদের সঙ্গে। এবং প্রদীপ এখানে কোন বিচ্ছিন্ন মানব নয়। সব দেশের,সব কালের ছিন্নমূলদের প্রতিনিধি হয়ে বেঁচে থাকে সে, যাদের স্মৃতিতে শৈশবের ছেঁড়া পাতা, ছেঁড়া শেকড়ের জন্য অতলান্ত মায়া, সেইসঙ্গে একধরণের নাছোড় বিপন্নতাবোধ। হঠাৎ করে চোখের সামনে থেকে তার পিসীমার আকার মুছে যাওয়া এই বিপন্নতাবোধের তাৎপর্য বহন করছে। ছিন্নমূলদের কাছে সবথেকে বড়ো সংকট বুঝি পরম আশ্রয়ের ছবিগুলো এভাবে ভেঙে যাওয়া।

'খোঁয়ারি' গল্পেও সময়ের চাপ অনুভব করা যায় বেশ। এখানে একটি হিন্দু বাঙালি পরিবারের সম্বল ও সাধ্য ক্ষয় পেতে

- পেতে তলানিতে ঠেকলেও ভিটে আঁকড়ে পড়ে থাকার আকুলতা যায় না। যুদ্ধ - পরবর্তীকালে নতুন গজিয়ে ওঠা স্থানীয় সামন্ততুল্য ক্ষমতাবানদের তোষণ করে টিকে থাকার কায়দা রপ্ত করতে না পেরে শেষ হয়ে যাচ্ছে যেসব হিন্দু বাঙালি পরিবার, সমরজিতের পরিবার তাদের অন্যতম। ইলিয়াস এদের কণ অস্তিত্বকে সামান্য দু - এক আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলেন এভাবে, 'ডিসি লাইনের ৪০ পাওয়ারের আলোর একটুখানি ময়লা আঁচল এসে লুটিয়ে পড়েছে দরজার পাশে, সেই অ ালোতে সমরজিৎকে বড়ো রোগা মনে হয়।'

ইফতিকার, ফাক, জাফরদের পরম বন্ধুর মতো আপ্যায়নে দরাজ সমরজিৎ। মদ ও পনিরের আয়োজনে কোথাও ত্রুটি থ াকে না কোন। কিন্তু জাফর ও ফাকরা হিসেবি। এদের নেশা জমে না ঠিক। সমরজিতদের বাড়িতে ওরা ওদের রাজনৈতিক সংগঠনের অফিস খুলতে চায়। সমরজিৎ ওদের বুঝিয়ে বলে ওর বাবা অমৃতলালের তীব্র অমতের কথা। কিন্তু ওরা বুঝলে তো ! ওদের শান্ত অবুঝপনাতেও এক ধরনের চাপা শাসানি। ওদিকে অমৃতলাল অনড়। কারণ সে স্মৃতি - আঁকড় ানো মানুষ --- 'আমাদের এই বাড়ির মইধ্যেনবাব সায়েব আহে নাই?...লক্ষ্মেৎ থাইকা বাঈজি আইছিলো...'। এদিকে অনেকখানি জায়গাজোড়া বাড়িটা তখন প্রায় খণ্ডহর। তার মধ্যে প্রেতের মতো বুড়ো বাবা, আর নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা চল্লিশ - ছোঁয়া ছেলে। গল্পটা এই ছবি দিয়েই শেষ হচ্ছে।

এখানে ইলিয়াসের ন্যারেশনের ভেতর থেকে উঠে এসেছে এক দুর্মর সলিচিউড। মায়ের সঙ্গে যৌবনকালে আরাকাতাকা -য় গিয়ে গার্সিয়া মার্কেস এই সলিচিউডকেই মর্মে - মর্মে অনুভব করেছিলেন সেখানকার প্রায় - পরিত্যক্ত জনবিরল পথে হাঁটার সময়, যে অনুভব 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা' -র জনক।

ইলিয়াসের একটি যথেষ্ট আলোচিত রচনা 'দোজখের ওম'। এটা মরণের দোরগোড়ায় পৌঁছনো কামালউদ্দিনের গল্প। ত ার কাছে জীবদ্দশা যেন দোজখবাস। সে কায়মনোবাক্যে তাই মৃত্যুকে চায়। কিন্তু মৃত্যু আসে কই? তার বদলে আসে তার মৃত পত্নী। কমালউদ্দিনকে গঞ্জনা দেয় সে, ''অহন তরি দুনিয়ার লালচ তোমার গেল না। দোজখের কীড়া, দোজখের লাহ ান ঘরের মইদ্যে থাকো, তয়ভি গতরখান উঠাইবা না।' কিন্তু কী করবে কামালউদ্দিন। আল্লাহ মর্জির ওপর 'একটি ফোঁড় বসাইবার ক্ষমতাও' কি আছে কারো? ফলে তার নিরবচ্ছিন্ন দোজখবাস, ইচ্ছার বিদ্ধেই। তার চেতনায় স্মৃতি আসে আর যায়। স্মৃতির মধ্যে মৃতরাই আসে মূলত। যেমন, তার ধার্মিক বাপ। মৃত মেয়ে নুন্নাহার। জীবিতদের মধ্যে আসে হানিফের ম া ভাবী। তার সব সেবাযত্নের ভার সামলায় মেয়ে খোদেজা। তার নাতি তাকে রাতে প্রস্রাব করায়। এক কথায় তার বড়ো সমস্যাজর্জর অস্তিত্ব, মৃত মুন্নাহার যখন এসে দাঁড়ায় তার ঘরে, সে আর্তনাদ করে ওঠে --- 'মা' রে, আমি কি কম? আ ল্লায় আমারে উঠাইয়া না লইলে কী করবার পারি?

এরই মধ্যে মারা গেল তার বড়ো ছেলে আকবর। আকবরের সৎকার হয়। সৎকারের আয়োজনে কোন ত্রুটি রাখে না ত ার পয়সাওলা ভাই আমজাদ। কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রকট হয়ে উঠতে থাকে আকবর ও আমজাদের বৌদির মধ্যে সংঘাত। এর পেছনে উস্কানি আমজাদেরই। মৃত আকবরের মেয়ে পরভীন কামালউদ্দিনের কাছে এসে অভিযোগ জানায়, 'চাচায় কয় এই বাড়ির মইধ্যে আমাগো নাকি হিস্যা নাই।' কথাটা ঝড় তোলে কামালউদ্দিনের মধ্যে। তার খানিক সময় লাগে একটা দৃঢ় অবস্থানে ফিরে যেতে, যেখান থেকে অন্যায়ের বিদ্ধে দাঁড়ানো যায়। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর পায়ের শব্দ কানে নিয়েও সে একটা লালা বল্‌কানো হুঙ্কার ছাড়তে পারে ঠিক, 'তোরচাচারে কইস দাদার অহন তরি বাঁইচা আছে।' দোজখের ওম্ নিংড়ে নেওয়া এই প্রাণবানতাই মৃত্যুর অন্ধকার সরিয়ে আলো ফেলে গল্পে । ইলিয়াস এখানে সময়কে এঁকেছেন পারিবা রিক বলয়ের গভীর থেকে। বাইরের সামাজিক ক্ষয় ভেতরেও মেন প্রবাহিত 'দোজখের ওম্' -এর পাঠক্রিয়ায় আমরা বেশ বুঝতে পারি। এই ক্ষয়ের ছবি অবশ্য অভিনব কিছু নয়। বরং বলা যেতে পারে আবহমান।

ইলিয়াস সম্পর্কে একটা অভিযোগ জ্ঞাপন করেছেন কেউ কেউ -- মুক্তিযুদ্ধের পর তাঁর গল্পগুলো প্রকাশ পেলেও মুক্তিযুদ্ধ তাঁর গল্পে তেমন উপস্থিত নয়। ইলিয়াসও এর জবাব দিয়েছেন স্পষ্ট স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে। তার মতে, মুক্তিযুদ্ধ অর্গানাইজড কিছু ছিল না। এই যুদ্ধের পেছনে ছিল না কোন আদর্শ। ডেফিনিট্ কোন লক্ষ্যও ছিল না যোদ্ধাদের। তারা যুদ্ধ করেছিল 'তার কারণ, না করলে তারা মারা পড়ত।' আর যুদ্ধ পরবর্তী সময়টাতো ইলিয়াসের ধারণায় 'চরম ফ্রাস্ট্রেটিং', যাকে বলে 'স্বপ্নভঙ্গের কাল'। এ - যুদ্ধের একটা বৈশিষ্ট্যই টানে তাঁকে, তা হল মানুষের প্রতিরোধ করার সংকল্প, 'এক তুলনাহীন সাহস।'

এই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাঁর গল্প 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' ও 'অপঘাত'। দুটি গল্পেই উঠে এসেছে যুদ্ধের বীভৎসতা। বস্তি জ্বালিয়ে, ব্রাশ্ ফায়ার করে পাকসেনারা যেসব কাণ্ড করে তা আমাদের পরিচিত বাস্তব। অন্ধকার কিংবা মৃত্যুর বহু প্রকার আছে, যেটুকু, তা হল মৃত্যু বা অন্ধকারের পাশাপাশি জীবন কিংবা আলোর দ্যুতি, যা ডকুমেন্টেশনের সীমা অতিক্রম করতে সাহায্য করে গল্পকে। ইলিয়াস লেখেন, 'ঐ বছরের শেষে শীতের ভেতর কুয়াশায় রোদ জ্বালিয়ে পাড়ার ছেলেরা পড়িয়ে ফেরে।' এরকম একটা বর্ণনার শব্দে - শব্দে তিনি যে বুনে দিয়েছেন যুদ্ধ - সমাপ্তির স্বস্তি। পাকসেনাদের ইনফর্মার নাজির আলির খোঁজ পেতে ছেলেরা যখন বেদম পেটাচ্ছে লালমিয়াকে, যুদ্ধে নিহত ইমামুদ্দিনের মা পুরনো কোন কৃতজ্ঞতায় তাকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। লালমিয়াকে সে তারপর আশ্রয় দিল। ইমামুদ্দিনের ছেলে বুলেট তার কাছে থাকে। যুদ্ধ শেষ হলেও লালমিয়ার দিন নিরাপদে কাটে না। চোখ বুজলেই খোয়াবের মধ্যে পড়ে সে। তার স্বপ্নের মধ্যে মওলানারা আসে, যাদের পা উল্টোদিকে ঘোরানো। স্বপ্নটা চারিয়ে যায় ইমামুদ্দিনের ছেলে বুলেটের মধ্যেও। সেও খোয়াবে দেখে উল্টোনো পায়ে এক মাওলানাকে। ঘুমের মধ্যে কোন শব্দ পেলেই ধড়মড় করে উঠে বসতে এই বুলেট। শব্দটা শুনে ভাবত ওর নিহত যুক্তিযোদ্ধা বাপ এসে বুঝি গ্রেনেড ছুঁড়ে ট্রান্সফরমার উড়িয়ে দিল। উল্টোপায়ের মানুষেরা খোয়াবের মধ্যে মাঝে - মাঝে তাড়া করে বুলেটকে। কিন্তু পা উল্টোনো বলে এগিয়ে আসার বদলে ক্রমশ পিছিয়ে যায় তারা। পাঠক এই পিছিয়ে যাওয়াটাকে যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের বাস্তবের কোন ইঙ্গিত বলে ভাবতে পারেন । ওলটানো পায়ের মওলানাদের সূত্রে অপশক্তির মিথটাকেও লেখক নিপুণতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন নতুন স্বাধীনতা নিয়ে সাধারণ মানুষের স্বপ্নভঙ্গ বোঝাতে। একদিন খোয়াবের মধ্যেই মওলানার ওলটানো পা লক্ষ্য করে প্রস্রাব করতে - করতে ঘুম ভেঙে যায় বুলেটের। সে দেখে তার পোশাক, বিছানা সব ভিজে একসা। বিছানায় প্রস্রাবের মতো অশুচিকর ব্যাপারটা মাঝে - মাঝেই ফিরে এসেছে এই গল্পে। এবং একেকজন পাঠক হয়তো একেকরকম প্রতীকী তাৎপর্যে গ্রহণ করবেন ব্যাপারটাকে। আখতাজ্জামানও তাঁর সময়কাল বিষয়ে তীব্র বীতশ্রদ্ধায় সম্ভবত সেটাই চেয়েছেন।

'অপঘাত' গল্পে কান্নার একটা অসামান্য ব্যবহার আছে। এখানে ছেলের শোকে মায়ে কাঁদে গভীর রাতে, নির্ঘুম -- নিথর অবস্থায় বিছানায় শুয়ে - শুয়ে। সেই ঘিনঘিন কান্নার শব্দ রাতকে কিছুতে বিশ্রাম দেয় না। মোবারক আলি -র ভয়, তার বৌ-এর কান্নার শব্দে এই বুঝি ছুটে এলে কাছের ক্যাম্প থেকে কোন সৈন্য। কান্নার কারণ নিয়ে জেরা করতে - করতে জেনে ফেলল, তার বড়ো ছেলে মুক্তিযোদ্ধা ছিল, ঘটনাস্থলেই প্রতিপক্ষের গুলিতে মরণ হয়েছে যার। এই গল্প অবশ্য শুরু হচ্ছে চেয়ারম্যানের বৌ -এর কান্নার শব্দে। সে তার টাইফয়েডে মৃত ছেলে শাজাহানের জন্য কাঁদে, যে মোবারকের মুক্তিযুদ্ধে মৃত ছেলে বুলুর বন্ধু ছিল। গল্পের টেনশন তৈরি হয় যেইমাত্র চেয়াররম্যানের ছেলে শাজাহানের লাস 'দাফন' করতে নিয়ে যাবার সময় শবযাত্রীদের বাধা দিল ক্যাম্পের মিলিটারিরা। না, ক্যাম্পের পাশ দিয়ে গোরস্থানে যাওয়া হবে না অতজন লোকে। ইমামকে সক্ষোভে প্রশ্ন করেন চেয়ারম্যান, 'ক্যান, মুর্দা কি কাফনের মধ্যে বন্দুক লিয়া যাচ্ছে?'

গোরস্থানে যাওয়া নিয়ে এই টানাহাঁচড়ার বিবরণের ফাঁকে - ফাঁকে ইলিয়াস গল্পটাকে ছড়িয়ে দিতে থাকেন অন্যতম শবযাত্রী মোবারক আলির স্মৃতির খেই ধরে। শবসুদ্ধ খাটিয়ার একপ্রান্ত কাঁধে নিয়ে সে তার মৃত ছেলে, যে কিনা 'মত্তি' ছিল, সেই বুলুকেই বহন করে স্মৃতিতে, সত্তায়। তার মনের পটে তখন নিরাকার আল্লার কোন ঠাঁই নেই। সেখানে শুধু 'ঝাঁঝরা - বুক বুলার চিত হয়ে থাকা লাশ।' বৌ - ডোবা খালের পানি ধুয়ে দেয় তার চুল।

সৎকারের সময়েই বাতাসে খবর ভাসে, স্থানীয় কড়িতলায় একদল দুধের ছেলে 'জাউরা' মিলিটারিগুলোকে খতম করে ফেলেছে। কড়িতলা -র প্রসঙ্গ উঠলে মোবারক হামলে পড়ে ইমাম সায়েবকে বুলুর বীরত্বের কথাই শোনায়। কিন্তু ঘরে ফিরে যেই সে দেখল তার বৌ, যে কিনা প্রধানত বুলু -র মা, স্বামীর দেরি দেখে দুশ্চিন্তায় কাতর, তার বিরক্তি জাগলো। এরপরই আসে গল্পের শেষ লাইন, যা সর্বকালের সাহিত্য- মানদণ্ডে অন্যতম অভিঘাতময় একটি উচ্চারণ 'সন্ধ্যার পর ছেলের জন্য হামলে কেঁদে মা যদি সারা গ্রাম মাথায় না তুললো তো বুলু এরকম মরা মরতে গেছে কোন দুঃখে?'

এভাবেই মৃতেরা দাপটে ঘুরে বেড়ায় ইলিয়াসের গল্পে। যদি যুদ্ধের দামামা না বাজাতো, যদি না আতঙ্ক ছড়াতো মিলিটারির তাণ্ডব, শাজাহানের অমন বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হত না। আসলে এক ধরনের দায় থেকেই ইলিয়াস দুটি মৃত্যুক তুলে এনেছেন গল্পর সীমায়, এদের 'পিভট্' হিসাবে ব্যবহার করবেন বলে। বুলুর মৃত্যু গৌরবের, কারণ সে রণাঙ্গনে মরেছে। কিন্তু গল্পের ভেতরের একটা ইভিল্ সিস্টেমকে চিহ্নিত করায় অনেক বেশি তাৎপর্য পেয়ে গেছে শাজাহানের মৃত্যু। এই সব

মৃত্যুর সঙ্গে লেপ্টে থাকা চরিত্রগুলো যন্ত্রণায় কাতরায় ঠিকই, কিন্তু একইসঙ্গে তাদের ধারালো চেহারাটাও মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে যা অবশ্যই একটা আগ্নেয় সংকেত।

নর - নারীর সম্পর্ক নিয়েও ইলিয়াসের অসামান্য কিছু গল্প আছে। উদাহরণ 'উৎসব' 'প্রেমের গল্প' ইত্যাদি। এবং ওই স ম্পর্কের ভূখণ্ডেও ছায়া পড়েছে সময়ের। সম্পর্ক তাতে অন্য মাত্রা পেয়েছে। 'উৎসব' গল্পটি যেরকম। বন্ধু কাইয়ুম - এর বিয়ের উৎসবে যোগ দিয়ে ঘরে ফিরে সে আনোয়ার তার বৌ সাহেলা বেগম - এর ভেতর আকর্ষণের কোন উপাদান খঁজে পায় না। আনোয়ার দেখে চোখের ঘুম - ঘুম ছায়া কেটে যাচ্ছে সালেহার। ঘুমের জায়গা নিয়েছে সরাসরি কাম। কিন্তু উৎসবে দেখা বন্ধুপত্নী কিংবা অচেনা বহু রূপসীর ছায়া আনোয়ারের স্মৃতিতে। তার ভয় হয়, সাহেলার জন্য উৎসবের স্মৃতির আবেশটা বুঝি হারিয়ে যায়। ঠিক এরকম মুহূর্তে রতিতে মগ্ন হতে গিয়ে যখন সে শরীর জুড়ে শীতলতা বোধ করছে, তার মনোযোগ কেড়ে নিলো বাইরের রাস্তায় হঠাৎ জেগে ওঠা হুল্লোড়। সে উঠে আসে। দেখে, কুকুর - কুকুরীর রতিক্রিয়া দেখছে একদল মানুষ, যাদের জীবন কাটে পথে ঘুরে, পথেই ঘুমিয়ে কিংবা না - ঘুমিয়ে। অর্থাৎ পরিশীলিত মানুষদের সাহচর্যের স্মৃতির আবেশ উপভোগ করতে না করতেই আনোয়ার যে এক ধাক্কায় ছিটকে পড়ল অপরিশীলিত এক বলয়ে, যাকে সে বৌএর কাছে উল্লেখ করে 'যতো সব ভালগার লোকজন' বলে। তবু যতোই সে একে 'ভালগার' বলুক, তথাকথিত অসভ্য লোকেদের স্ফূর্তিটাই কিন্তু আনোয়ারকে তার শরীরী উষ্ণতা ফিরিয়ে দেয়। এরপরই সে আবার বৌ -এর কাছে। তার রতির মেজাজ ফিরে পাওয়াটাকে ইলিয়াস এভাবে আনেন 'আয়োয়ার আলির হাত থেকে রবারের পু গ্লাভ্স্ খুলে গেছে। চামড়ার আবরণটাও উঠে যাচ্ছে নাকি?'

ইলিয়াস এই গল্পে মোক্ষম একটি বিতর্ক উস্কে দিয়েছেন। যথার্থ ভালোবাসার উষ্ণতার জন্য আনোয়ারকে কিনা ফিরে যেতে হচ্ছে এলিটদের একেবারে বিপরীত মেতে থাকা তথাকথিত ভাল্গার মানবগোষ্ঠীর আশ্রয়ে! সোফিস্টিকেশন্ স ম্পর্কে লেখকের বীতরাগটি গোপন থাকেনি এখানে। সোফিস্টিকেশন আসলে যে কৃত্রিমতার পোষাক আর এই কৃত্রিমতা যে তাঁর সময়েরই দান, এই বোধ ইলিয়াসের কণ্ঠস্বরের অভিমুখ নির্দিষ্ট করে দেয়। ফলে, তিনি যখন কথা বলেন, তাঁর কথ ায় আড়াল থাকে না। তিনি কথা বলেন তাঁর নিজস্ব অবস্থান চিনিয়ে দেবার জন্যই।

আসলে সময়ই একজন লেখকে ভাঙে, গড়ে। সারাক্ষণ সময়কে নানা মাত্রায় দেখে - শুনে তিনি কালকে জয় করার আশর্চ্য চাবিকাঠি খুঁজে ফেরেন। আখতাজ্জামান ইলিয়াসও সময়ের দ্বার নির্দিষ্ট প্রবল এক কণ্ঠস্বর, সময়কালের ছবি আঁকতে গিয়ে যিনি ছুঁতে চেষ্টা করেছেন সময়াতীত এক স্তরকে, মাটিতে কান পেতে শোনবার চেষ্টা করেছেন গভীরে জেগে ওঠা কে ান কম্পনধ্বনি, যে কম্পন আশায় বুক বাঁধতে বলেছিলেন, রোগীকে সনাক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে রোগ জীবাণু -র উৎস চিনিয়ে দেওয়াটাও সংকট।' তিনি বলেন এই সংকটটাই তাঁকে লিখতে, লিখতে যেতে প্রণোদিত করেছে। তা বলে তিনি এই 'বিচ্ছিন্নতার সংকট'কে গৌরবান্বিত করেননি, যেমনটা করেছেন স্বদেশ ও বিদেশের কোনো কোন সাহিত্যিকার। তার মতে, 'অসুস্থ লোককে রোগী বলে সমাজের মধ্যে থেকেও মানুষ কিভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমশ পরিণত হচ্ছে নিছক গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকা একটা 'কোঁচকানো' শরীরে, সেই সত্য আমরা ইলিয়াস পাঠে যেরকম প্রখর মাত্রায় উঠে আসতে দেখি,সেরকমটা খুব বেশি কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আধুনিক পাঠককে আয়নার সামনে দাঁড়াতে তিনি একরকম বাধ্যই করেন।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com